ATMADEEP

An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Impact Factor: 4.5 (IIFS), 8.5 (IJIN)
Volume- II, Issue-IV, March, 2026, Page No. 1914-1920
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.2.issue.04W.415

সন্‌জীদা খাতুনের স্মৃতিকথায় শান্তিনিকেতন প্রসঙ্গ

সুপর্ণা মণ্ডল, *গবেষক, তুলনামূলক সাহিত্য কেন্দ্র, ভাষা ভবন, বিশ্বভারতী, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*

Received: 15.03.2026; Accepted: 17.03.2026; Available online: 31.03.2026
©2026 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

From the very inception of Visva-Bharati, students, scholars, and teachers have come to Santiniketan from across the world. Many students also come from the neighbouring country, Bangladesh. These students later form a special connection with Santiniketan. Sanjida Khatun was one of them. She became famous later in life as a Rabindrasangeet singer and founder of Chhayanaut, but she spent her early days in Santiniketan. She wrote about her memories of Santiniketan in her books titled 'Santiniketaner Dinguli' and 'Sahaj Kothin Dwande Chhonde.' These books reflect life in Santiniketan at that time. As East Pakistan (later Bangladesh) was going through a lot of turmoil at the time, Santiniketan became her place of refuge. This essay aims to discuss Sanjida Khatun's experience in Santiniketan, as recounted in her memoirs.

Keywords: Sanjida Khatun, Santiniketan, Visva-Bharati, Memoir, Bangladesh

বিশ্বভারতীর সূচনালগ্ন থেকেই বিভিন্ন দেশের শিক্ষার্থী, গবেষক ও শিক্ষকেরা যোগ দিয়েছেন বিদ্যাচর্চার এই প্রাঙ্গনে। "যত্র বিশ্বম্ ভবত্যেকনীড়ম্"- বিশ্বভারতীর এই মূল মন্ত্র সার্থক হয়েছে বিশ্বের যোগদানে। প্রতিবেশী রাষ্ট্র বাংলাদেশ থেকেও বহু শিক্ষার্থী বিভিন্ন সময় বিশ্বভারতীতে এসেছেন এবং সেই সূত্রে শান্তিনিকেতনের সঙ্গেও তাঁদের একটা যোগসূত্র তৈরি হয়ে গেছে। এমনই একজন ব্যক্তিত্ব সন্‌জীদা খাতুন। রবীন্দ্রসঙ্গীত শিল্পী, রবীন্দ্র বিশেষজ্ঞ ও সাংস্কৃতিক সংগঠক হিসাবে সুপরিচিত সন্‌জীদা খাতুন বিশ্বভারতীতে পড়াশোনার সূত্রে দীর্ঘ সময় এখানে যাপন করেছেন। তাঁর সেই অভিজ্ঞতা তিনি নথিভুক্ত করেছেন 'সহজ কঠিন দ্বন্দ্বে ছন্দে' নামক তাঁর আত্মজীবনী এবং 'শান্তিনিকেতনের দিনগুলি' নামক স্মৃতিকথামূলক গ্রন্থে। এই গ্রন্থদুটি থেকে তৎকালীন শান্তিনিকেতনের পরিবেশ সম্বন্ধে সম্যক ধারণা পাওয়া যায়। সেই সময়ের শান্তিনিকেতনে বসবাসকারী বহু সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্বদের সঙ্গে সন্‌জীদা খাতুনের আলাপ হয়েছিল যার বর্ণনা রয়েছে এই গ্রন্থদুটিতে। আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থী হিসাবে সব সময় যে তাঁর ভালো অভিজ্ঞতা হয়েছে তা নয়, খারাপ অভিজ্ঞতার কথাও কিছু কিছু উল্লেখ করেছেন তিনি। ১৯৫৪ সালের শেষ দিকে তিনি প্রথম শান্তিনিকেতনে আসেন। তার পর থেকে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন কাজে তিনি এখানে এসেছেন। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের যখন টালমাটাল অবস্থা তখন শরণার্থী হয়েও তিনি এসেছিলেন শান্তিনিকেতনে। তাঁর অভিজ্ঞতায় শান্তিনিকেতন, সেখানকার মানুষ ও পরিবেশ যেভাবে পরিস্ফুট হয়েছে তা এই প্রবন্ধে আলোচনা করা হবে।

ছোটবেলা থেকেই সন্‌জীদা খাতুনের কাছে শান্তিনিকেতন ছিল এক "স্বপ্নের দেশ।" রবীন্দ্রনাথের প্রতি প্রীতির ভাব থেকে শান্তিনিকেতন নিয়ে একটা কল্পনা তাঁর মনে জেগে উঠেছিল। কিন্তু সেই সময় একটি মেয়ের বিদেশে পড়তে আসা এত সহজ ছিল না। পরিবার থেকে স্বাভাবিক ভাবেই রাজি ছিল না। তবে তিনিও হাল ছাড়েননি। বি.এ. অন্তিম বর্ষে নিজেই উদ্যোগ নিয়ে বিশ্বভারতীতে আবেদনপত্র পাঠিয়ে দেন। আবেদন গৃহীত হলে তাঁর বাবা-মাও শেষ অব্দি রাজি হয়ে যান। বিশ্বভারতী বাংলা বিভাগের তৎকালীন বিভাগীয় প্রধান প্রবোধচন্দ্র সেন ছিলেন সন্‌জীদা খাতুনের বাবা কাজী মোতাহার হোসেনের বন্ধু। গবেষণার বিষয়ে বিভিন্ন ভাবে সন্‌জীদার পথ প্রদর্শন করেছিলেন তিনি। সত্যেন্দ্রনাথ দত্তকে নিয়ে গবেষণার অনুপ্রেরণাও তাঁর কাছ থেকেই পেয়েছিলেন সন্‌জীদা। সেই সময় বিশ্বভারতীতে গবেষণা ও পঠনপাঠনের সংস্কৃতির একটা পরিচয় লেখিকার স্মৃতিকথা থেকে পাওয়া যায়।

শান্তিনিকেতনে দৈনন্দিন জীবনযাপনের নানা স্মৃতিও ধরা রয়েছে সন্‌জীদা খাতুনের 'শান্তিনিকেতনের দিনগুলি' গ্রন্থে। এম.এ. শিক্ষার্থী হিসাবে ভর্তি হওয়ার পর তিনি শ্রীসদন (তৎকালীন শ্রীভবন) হস্টেলে থাকতেন। তখনকার অভিজ্ঞতা নিয়ে তিনি লিখেছেন,

> "স্কুলের ওপরদিককার শিক্ষার্থীরা আমাদের একতলা ব্লকের বাথরুম ব্যবহার করত। যাবার পথে মিনুদিকে সম্ভাষণ না করলে চলত না ওদের। সেভেন, এইট, নাইন, টেন-এর গানপাগল মেয়ে এরা। সেভেনের শ্যামলী খাস্তগীর, এইটের রমা, নাইনের ইন্দ্রাণী, মহাশ্বেতা আরও সব কারা। নতুন গান শিখলে শোনাত, গাইতে হতো মিনুদিকেও। প্রিয় গানের ফরমাশ হতো তো! আমি এমএ দ্বিতীয় পর্বের ছাত্রী। ওদের সঙ্গে কলকল করে গল্প চলত। কোথায় ভেসে যেত বয়সের বাধা।"[১]

মিনুদি নামেই তিনি এত বেশি পরিচিত ছিলেন যে অনেকে তাঁকে ওই নামেই চিনত, সন্‌জীদা নামটি হয়তো জানতই না। 'সহজ কঠিন দ্বন্দ্বে ছন্দে' গ্রন্থে এ প্রসঙ্গে একটি অভিজ্ঞতার কথা তিনি লিখেছেন। একবার আমেরিকায় গানের অনুষ্ঠানে গিয়ে শান্তিনিকেতনের প্রাক্তন ছাত্রী সুপর্ণা লাহিড়ীর সঙ্গে সন্‌জীদা খাতুনের দেখা হয়। অনুষ্ঠান শেষে তাঁর কাছে এসে তিনি বলে ওঠেন, "অ্যাই মিনুদি, তুমি আবার কবে সন্‌জীদা খাতুন হলে?"[২] নামের কারণে কখনও কখনও তাঁকে বিড়ম্বনার শিকারও হতে হয়েছে। সকলে "মিনু" নামটি শুনে ধরে নিত তিনি হিন্দু। একবার যেমন শান্তিনিকেতনে তেজেশ সেনের সঙ্গে তিনি দেখা করতে গিয়েছিলেন তখন পূর্ব পাকিস্তানের পরিস্থিতি নিয়ে তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করছিলেন তেজেশ সেন। কথা প্রসঙ্গে সন্‌জীদা জানান যে তাঁর বাবা স্ট্যাটিসটিক্সে বিভাগের প্রধান। এই কথা শুনে তিনি মন্তব্য করে বসেন যে ওই বিভাগে মুসলমান না পাওয়ায় তাঁর বাবাকে প্রধান করা হয়েছে। এই কথা শুনে স্বভাবতই বিব্রত হন সন্‌জীদা খাতুন। আসলে তেজেশ সেন সন্‌জীদা খাতুনের "মিনু" নাম শুনে তাঁকে হিন্দু ভেবে নিয়ে এই মন্তব্য করেছিলেন। পরে অবশ্য নিজের ভুল বুঝতে পেরে সন্‌জীদার কাছে ক্ষমাও চেয়েছিলেন তিনি।[৩] ধর্মীয় কারণে এমন বহু অপ্রীতিকর ঘটনার সাক্ষী থেকেছেন সন্‌জীদা খাতুন। তবে ধর্মীয় গোঁড়ামির ঊর্ধ্বে উঠে আপন করে নেওয়ার মতো মানুষের সংখ্যাও কম ছিল না শান্তিনিকেতনে। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের পরিবার ছিল এমন একটি জায়গা। এ প্রসঙ্গে তিনি লিখেছেন-

> "শান্তিনিকেতনের প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের পরিবারের প্রতি আমার মা খুব অনুকূল ছিলেন। জীবনে কত জায়গাতেই তো মুসলমান বলে হেনস্তার পাত্র হয়েছেন! তাই ওঁদের বাসায় আমাকে পরিচয় করিয়ে। দিয়ে বলেছিলেন–এই বাড়িতে মুসলমান বলে কোনো

> মানুষকে ছোট করা হয় না। সত্যি সত্যি ওঁদের বাড়িতে কারও কাছে কোনো অবহেলা পাইনি।"[৪]

শান্তিনিকেতনের সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলের সঙ্গে ওতোপ্রোত ভাবে জড়িয়ে গিয়েছিলেন সন্‌জীদা খাতুন। 'শান্তিনিকেতনের দিনগুলি' গ্রন্থটিতে তিনি সময়ের সরলরৈখিক গতি অনুসারে লেখেননি। স্মৃতিতে যখন যা এসেছে সেই ভাবেই লিখেছেন। তবে এই গ্রন্থের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ তাঁর গান শোনার স্মৃতি। এভাবেই এসেছে কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথা, শান্তিদেব ঘোষের কথা, নীলিমা সেনের কথা-

> "কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'স্বপন যদি ভাঙিলে' শুনেছিলাম একবার পৌষমেলার সময়ে ছাতিমতলার উপাসনায়। ওঁর গান ছিল প্রথমেই। আমি ওখানে পৌঁছে তখনো বসতে পারিনি, 'ভাঙিলে'র টানের সঙ্গে সঙ্গে আমার চোখ দিয়ে দরদর করে জল ঝরে পড়ল! কী লাবণ্যময় যে সে-উচ্চারণ!"[৫]

সেই সময় শান্তিনিকেতনে গান গাওয়ার, গান শোনার যে সংস্কৃতি ছিল তার পরিচয় পাওয়া যায় সন্‌জীদা খাতুনের স্মৃতিকথায়। গান নিয়ে গোঁড়ামির কথাও তিনি উল্লেখ করেছেন এক জায়গায়। শান্তিনিকেতনের মেয়েরা শুধু রবীন্দ্রসঙ্গীতই গাইবে এই ছিল অনেকের ধারণা। একবার বিশ্ববিদ্যালয়ের এক্সকারশনে কটকে বেড়াতে গিয়ে মুজতবা আলীর সঙ্গে দেখা হয়েছিল তাঁদের। সেখানে মুজতবা আলী সন্‌জীদার কাছে পল্লিগীতি শুনতে চেয়েছিলেন। তিনি পল্লিগীতি গাওয়ায় তা নিয়ে অনেকে আপত্তি জানিয়েছিল। এই বিষয়ে আর একটি অভিজ্ঞতার কথাও তিনি লিখেছেন। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ নিবে একবার একটি গীতি-আলেখ্য হয় 'রূপান্তরের গান' নামে। সেখানে 'আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো' থেকে শুরু করে অনেক গণসংগীত ছিল। সেই নিয়ে অনেকে আপত্তি তুলেছিল। কিন্তু সন্‌জীদা কখনই এই ধরনের গোঁড়ামিকে সমর্থণ করেননি। তিনি লিখেছেন-

> "অথচ লাইব্রেরির বারান্দায় নির্মলেন্দু চৌধুরীর গানও তো হয়েছে। তিনি তো পল্লিগীতিই গেয়েছিলেন শান্তিনিকেতনে। রবীন্দ্রনাথের আমলে সাহেবদের অদ্ভুত উচ্চারণে রবীন্দ্রসংগীতও তো হয়েছে আশ্রমে। তার বেলা? এসব আপত্তির কোনো মানে বুঝি না। বুঝি, রবীন্দ্রনাথের অন্তত ও রকমের অদ্ভুত গোঁড়ামি ছিল না।"[৬]

এই ধরনের সংকীর্ণতার কারণে অনেক চেষ্টা করেও সংগীত ভবনে গান শেখার জন্য চেষ্টা করেও সেখানে টিকতে পারেননি তিনি।

এছাড়া শান্তিনিকেতনের সাহিত্যচর্চার প্রসঙ্গও পাওয়া যায় সন্‌জীদা খাতুনের স্মৃতিকথায়। শিক্ষা ও বিদ্যা ভবনে সেই সময় 'সাহিত্যিকা'-র আসর বসত যেখানে শিক্ষার্থীরা নিজেদের লেখা গল্প, কবিতা, প্রবন্ধ ইত্যাদি পাঠ করত। 'সাহিত্যিকা'-র সম্পাদক পূর্ণানন্দ চট্টোপাধ্যায় একবার সন্‌জীদা খাতুনকে সেখানে কবিতা পাঠের আহ্বান জানান। তিনি কবিতা লেখেন না বলাতে শেষ অব্দি কবিতাবিষয়ক একটি প্রবন্ধ পাঠের জন্য তাঁকে ডাকা হয়। সভাপতি অশোকবিজয় রাহা তাঁর প্রবন্ধের অনেক প্রশংসাও করেছিলেন। প্রবোধচন্দ্র সেন সেই সময় কিছু সমালোচনা করলেও পরে প্রবন্ধটি একটি পত্রিকায় ছাপার ব্যবস্থাও করে দেন।[৭] এই সমালোচনার জন্য অবশ্য একটু অভিমানও হয়েছিল তাঁর। এম.এ. ক্লাসের সেমিনারে প্রমথ চৌধুরীর উপর লেখা প্রবন্ধ একটি পত্রিকায় ছাপা হলে সেটিও খুব প্রশংসিত হয়েছিল। এম.এ.-এর পরেও বিভিন্ন সময় যখন তিনি আসতেন কোন লেখা শেষ হওয়ার পর মতামত নেওয়ার জন্য কখনও সত্যেন সেন, কখনও শান্তা ও অসিত

ভট্টাচার্যকে শোনাতে যেতেন। রতনকুঠীর স্কলার্স ব্লকে নিজের ঘরেও কখনও কখনও এইসব পাঠের আসর আয়োজন করতেন তিনি।

১৯৭৫ সালে বঙ্গবন্ধুর হত্যাকাণ্ডের পর বাংলাদেশে পরিস্থিতি আশঙ্কাজনক হয়ে ওঠায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ছয় মাসের স্টাডি লিভ নিয়ে শান্তিনিকেতনে গবেষণার কাজে ফিরে আসেন সন্‌জীদা। তবে ভর্তি হতে যথেষ্ট বেগ পেতে হয় তাঁকে। উপাচার্য তাঁকে জানান যে কিছুদিন আগে শান্তিনিকেতনে নাকি প্রাচীরঘেরা সি.আই.এ.-এর আস্তানা পাওয়া গেছে তাই সরকারি নির্দেশ ছাড়া আর কোন বিদেশীকে ভর্তি নেওয়া হবে না। তবে এরপর দিল্লি থেকে তাঁর নামে একটি বড় টেলিগ্রাম আসে যার ফলে তাঁকে ভর্তি নিয়ে নেওয়া হয়। পরে তিনি জেনেছিলেন এই টেলিগ্রামের পিছনে কবি নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর ভূমিকা ছিল। তাঁর প্রতি যথাযোগ্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন সন্‌জীদা খাতুন।[৮] নয় মাস পরে তিনি যখন গবেষণাপত্র জমা দেন তখন পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক অবাক হয়ে যান। সার্বিক ভাবে বাংলাদেশের শিক্ষার্থীদের সম্পর্কে তাঁদের অভিজ্ঞতা ভালো ছিল না। তবে গবেষণা পর্বে অনেক জ্ঞানীগুণীজনের সহায়তাও পেয়েছিলেন তিনি যা তাঁর গবেষণাকর্মটিকে সমৃদ্ধ করে তুলতে সাহায্য করেছিল।

হস্টেল ছাড়াও শান্তিনিকেতনে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন জনের বাড়িতে থাকার অভিজ্ঞতা নিয়েও লিখেছেন সন্‌জীদা। এই প্রসঙ্গেই এসেছে শ্যামলী খাস্তগীরের কথা। তাঁর বিখ্যাত 'পলাশ' বাড়িতে কিছু দিন ছিলেন লেখিকা। আণবিক অস্ত্রের বিরুদ্ধে শ্যামলী খাস্তগীরের প্রতিবাদী অবস্থানের কথাও উল্লেখ করেছেন তিনি। প্রতিবাদের অন্যতম মাধ্যম হিসাবে শ্যামলী খাস্তগীর বেছে নিয়েছিলেন তাঁর ছবিগুলিকে। সেই সব ছবির প্রদর্শনী হলে সেখানে সন্‌জীদা খাতুন গান গাওয়ার আমন্ত্রণ পেয়েছিলেন। দুজনের মধ্যে খুবই আন্তরিক সম্পর্ক ছিল।

এছাড়া শান্তিনিকেতনে ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্ক নিয়েও বেশ কিছু মজার মজার গল্প ও অভিজ্ঞতার কথা উল্লেখ করেছেন সন্‌জীদা খাতুন। কবি ও অধ্যাপক অশোকবিজয় রাহার সেই বিখ্যাত কবিতা "চমকে উঠি– আরে! আধখানা চাঁদ আটকে আছে টেলিগ্রাফের তারে!" এই নিয়ে ছাত্ররা তাঁর সঙ্গে ঠাট্টা করত। শৈলেশ্বর বাগ নামের এক ছাত্র একবার তাঁর কাছে গিয়ে বলেছিল, "অশোকদা, আমি একটা কবিতা লিখেছি— 'অশোকবিজয় রাহা/আ-হা!" অশোকবিজয় রাহাও একদিন সেই ছাত্রটিকে ডেকে বললেন, "শোনো হে, আমিও একখান কবিতা লিখেছি। সেটা হলো— 'শৈলেশ্বর বাগ/ভাগ।"[৯] এই ধরনের অনেক মজাদার কাণ্ড চলত শান্তিনিকেতনে। আর একটি ঘটনার কথা যেমন সন্‌জীদা খাতুন লিখেছেন-

> "শিল্পী মুকুল দের কন্যা মঞ্জরী একদিন ক্লাসে গিয়ে দেখে চিরকুমারী খিটখিটে স্বভাবের নলিনীদি মেয়েদের একে একে দাঁড় করিয়ে প্রতিজ্ঞা করাচ্ছেন, 'আমি জীবনে কখনো বিবাহ করিব না।' মঞ্জরীর পালা এলে ও উঠে দাঁড়িয়ে গড়গড় করে বলল, 'আমি জীবনে সুযোগ পাওয়ামাত্র বিবাহ করিব'।"[১০]

তবে শান্তিনিকেতনে সব সময় যে তাঁর ভালো অভিজ্ঞতাই হয়েছিল এমন নয়। কখনও কখনও এখানে অবহেলার শিকারও হতে হয়েছে সন্‌জীদা খাতুনকে। বাংলাদেশে উনি যতটা বিখ্যাত ছিলেন রবীন্দ্রসংগীতশিল্পী আর ছায়ানটের প্রতিষ্ঠাতা হিসাবে, শান্তিনিকেতনে সব সময় সকলে তাঁর সেই পরিচয় জানত না। ফলে নিজের যোগ্যতা নিয়ে অনেক বাঁকা মন্তব্য তাঁকে শুনতে হয়েছে বিভিন্ন সময়। একবার উপাচার্য অম্লান দত্তের বাড়িতে আগত লন্ডনপ্রবাসী এক দম্পতি তাঁর ছাত্র ইকবালের গানের কথা বলছিলেন।

কিন্তু ইকবাল তাঁর ছাত্র একথা বলতেই তাঁরা সন্দেহের চোখে ওনার দিকে তাকান। তারপর ছায়ানটের অধ্যক্ষ হিসাবে নিজের পরিচয় দেওয়াতে তাঁদের সন্দেহ আরো বেড়ে যায়।[১১] আসলে পোশাক-পরিচ্ছদের দিক দিয়ে তিনি সব সময় সাধারণ থাকতেই ভালোবাসতেন। এই কারণে অনেকে তাঁর যোগ্যতা নিয়ে সন্দেহ করত।

শান্তিনিকেতনে জওহরলাল নেহরুর সঙ্গে দেখা হওয়ার অভিজ্ঞতাও আলোচ্য গ্রন্থদুটিতে লিপিবদ্ধ করেছেন সন্‌জীদা খাতুন। নেহেরু শান্তিনিকেতন এলে বিদেশি ছাত্রছাত্রীদের তাঁর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়া হয়েছিল একবার। উদয়নের একতলার ঘরে বসে তাঁদের সঙ্গে কথা বলেছিলেন নেহেরু। মনোযোগ দিয়ে সকলের কথা শুনেছিলেন। প্রতিটি দেশের সঙ্গে ভারতের সম্পর্ক নিয়ে বলতে বলতে বারবার এশিয়ার ঐক্যের উপরেই জোর দিয়েছিলেন তিনি। উদয়ন ভবনের বাইরে তাঁদের সঙ্গে ছবিও তুলেছিলেন নেহরু। পাকিস্তান আমলে সন্‌জীদা খাতুনের বাড়ি থেকে এই ছবি চুরি যায়। ভারত আর নেহরুর সঙ্গে তাঁর অন্তরঙ্গতার প্রমাণ হিসাবে কেউ সেই ছবি নিয়ে চলে যায়। সন্‌জীদা খাতুন মজা করে লিখেছেন, "গুপ্তচর বিভাগের দপ্তরে ওগুলোর খুব কদর হয়েছিল নিশ্চয়ই!"[১২] একদিকে বাংলাদেশের একটা শ্রেণি তাঁকে ভারতের গুপ্তচর ভাবত, অন্যদিকে ভারতেও একবার তাঁকে নিয়ে গুজব রটে যায় যে তিনি নাকি কেজিবির এজেন্ট। নরেশ গুহ নাকি প্রতিভা বসুর বাড়িতে এই কথা বলেছিলেন। এই কথা শুনে তিনি খুবই মর্মাহত হয়েছিলেন- "দেশে বাঙালি সংস্কৃতির উন্নয়ন আর প্রসারের জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করে অবশেষে এই নাম জুটল আমার!"[১৩] তবে এই গুজব রটার কারণ পরে তিনি বুঝতে পেরেছিলেন। তাঁর কন্যা রুচিরা মস্কোয় পড়াশোনা করতেন। তিনি একবার 'সিসিসিপি' লেখা একটা ব্যাগ নিয়ে আসেন। সন্‌জীদা সেই ব্যাগ নিয়ে শান্তিনিকেতন এসেছিলেন। হয়তো সেই ব্যাগ থেকেই লোকজন তাঁকে রাশিয়ার গুপ্তচর ভেবে বসেছিল।[১৪] উপাচার্য প্রতুল গুপ্ত সন্‌জীদা খাতুনকে রবীন্দ্রভবনের একটি ফেলোশিপ দিয়েছিলেন। তা নিয়েও অনেকে সমালোচনা করত। অনেকে বলতেন, "ইন্দিরা গান্ধী বাংলাদেশের ওদের চাকরি দিতে চান, ভালো কথা, চাকরি তৈরি করুন! আমাদের জন্যে যেসব চাকরি, তা ওদের দেওয়া হবে কেন?"[১৫] এই ধরনের সমালোচনা সাময়িক ভাবে তাঁর মনকে বিষিয়ে দিত ঠিকই কিন্তু পরে তিনি নিরপেক্ষ ভাবেও এগুলি বিশ্লেষণের চেষ্টা করেছেন। 'সহজ কঠিন দ্বন্দ্বে ছন্দে' গ্রন্থে তিনি লিখেছেন, ভারত যেভাবে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে সহায়তা করেছে, তার প্রতিদান কি তাঁরা দিতে পেরেছেন? এমনকি বাংলাদেশের সাধারণ মানুষের মনেও তিনি এই নিয়ে কোন কৃতজ্ঞতার বোধ তৈরি হতে দেখেননি।[১৬]

শান্তিনিকেতন নিয়ে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন স্মৃতিকথা রচিত হয়েছে। এই সমস্ত স্মৃতিকথায় রবীন্দ্রনাথ ও শান্তিনিকেতন নিয়ে একটা রোমান্টিক ভাবনা কাজ করেছে কোন কোন সময়। তবে সন্‌জীদা খাতুন তাঁর স্মৃতিকথায় শান্তিনিকেতনের বাস্তব রূপকেই তুলে ধরেছেন। অপ্রিয় সত্য উচ্চারণ করতেও ভয় পাননি। রবীন্দ্রনাথের প্রতি তাঁর যে অনুরাগ সেটিও কোন দিন অন্ধ ভক্তির পর্যায়ে যায়নি। আত্মজীবনীর এক জায়গায় তিনি লিখেছেন যে শান্তিনিকেতনে অনেকে রবীন্দ্রনাথকে 'গুরুদেব' বলে সম্বোধন করত কিন্তু তিনি কোন দিন এই নামে তাঁকে ডাকেননি। আসলে তাঁর মনে হত এই ডাকটি ব্রহ্মচর্যাশ্রমের ভাবনার সঙ্গে যুক্ত কিন্তু তিনি যখন বিশ্বভারতীতে ভর্তি হন ততদিনে আশ্রমের সেই আগের পরিবেশ আর ছিল না। ফলে এই সম্বোধনের প্রয়োজনীয়তাও তিনি অনুভব করেননি।[১৭]

আত্মজীবনী 'সহজ কঠিন দ্বন্দ্বে ছন্দে'-র অনেকটা অংশ জুড়ে শান্তিনিকেতনের অনেক মানুষদের স্মৃতিচারণ করেছেন সন্‌জীদা খাতুন। প্রখ্যাত রবীন্দ্রসঙ্গীত শিল্পী নীলিমা সেন এমন একজন। তাঁকে সবাই

বাচ্চুদি বলেই ডাকত। ১৯৭১ সালে তিনি যখন শরণার্থী অবস্থায় সন্তানদের নিয়ে শান্তিনিকেতনে আসেন তখন নীলিমা সেন তাঁকে অনেক সাহায্য করেছিলেন। এছাড়া শিল্পী রামকিঙ্কর বেজের সঙ্গেও তাঁর দেখা হয়েছিল। সরাসরি আলাপ না থাকলেও তাঁর কথা গানের সূত্রে আগে থেকেই জানতেন রামকিঙ্কর।[১৮] ১৯৭৫-এর পর অনিল চন্দ ও রানী চন্দের সঙ্গে আলাপ হয়েছিল তাঁর। তাঁদের বাড়িতে প্রচুর ফলের গাছ ছিল। ওঁদের বাড়িতে বেড়াতে গেলেই কিছু না কিছু ফল প্রাপ্তি হত সন্‌জীদার। ক্ষিতিমোহন সেনের ভাইপো সত্যেন সেনের সঙ্গেও তাঁর খুব ভালো সম্পর্ক ছিল। তাঁদের পরিবারের সঙ্গে জড়িত বেশ কিছু স্মৃতিও লিপিবদ্ধ করেছেন তিনি। ক্ষিতিমোহন সেনের সঙ্গেও তাঁর দেখা হয়েছিল কিন্তু তিনি তখন পুরোপুরো শয্যাশায়ী। নন্দলাল বসুর সঙ্গেও অল্প সময়ের জন্য সাক্ষাৎ হয়েছিল তাঁর। এছাড়া অমিতা ঠাকুর ও অমিয়া ঠাকুরের কথাও কিছুটা লিখেছেন তিনি। অমিয়া ঠাকুরকে দেখে তাঁর মনে হয়েছিল "আন্তবিস্মৃত ভাবলোকের মানুষ।"[১৯] ২০০১ সালে রবীন্দ্রসঙ্গীতের স্বরলিপির বিবর্তন নিয়ে কাজ করতে আবার শান্তিনিকেতনে আসেন সন্‌জীদা খাতুন। সেই সময় মূলত রবীন্দ্র ভবন থেকে জরুরি নথিপত্র অনুসন্ধানের কাজ করছিলেন তিনি। তখন রবীন্দ্র ভবনের পরিচালক ছিলেন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের তুলনামূলক সাহিত্যের অধ্যাপক স্বপন মজুমদার। বিভিন্ন কারণে রবীন্দ্র ভবন কর্তৃপক্ষের তরফ থেকে সহযোগিতার অভাব বোধ করেছিলেন সন্‌জীদা খাতুন। সেই কারণে কাজ পুরোপুরি সমাপ্ত না করেই তিনি কলকাতা চলে যান এবং বাকি কাজ সেখান থেকে সমাপ্ত করেন।[২০] এই তিক্ত অভিজ্ঞতার পর তাঁর শান্তিনিকেতন যাওয়া এক রকম ভাবে বন্ধই হয়ে গিয়েছিল।

ভালোমন্দে মেশানো সন্‌জীদা খাতুনের শান্তিনিকেতনে কাটানো দিনগুলি সার্থকতা অর্জন করে যখন বিশ্বভারতীর তরফে তাঁকে সর্বোচ্চ সম্মান দেশিকোত্তম অর্পণ করা হয়। বাংলাদেশের সকলেই খুব আনন্দিত হন তাঁর এই প্রাপ্তিতে। ছায়ানটের সদস্যদের মধ্যে কে কে তাঁর সঙ্গে যাবেন সেই নিয়ে সাড়া পড়ে যায়। ৩০ জনের একটি দল তাঁর সঙ্গে শান্তিনিকেতন যায় এই উপলক্ষে। শান্তিনিকেতনের মানুষেরাও সন্‌জীদা খাতুনের এই প্রাপ্তিতে খুব খুশি হয়েছিলেন। আসলে তিনি যতটা বাংলাদেশের, ততটাই তো শান্তিনিকেতনেরও। ফলে শান্তিনিকেতনের মানুষদেরও তাঁর উপর সেই অধিকারবোধ ছিল। আত্মজীবনী 'সহজ কঠিন দ্বন্দ্বে ছন্দে'-তে তাই তিনি লিখেছেন- "আমার উচ্চশিক্ষার কেন্দ্র শান্তিনিকেতনে যা পেলাম তার কোনও তুলনা নেই। জীবনে এর চেয়ে বড় প্রাপ্তি আর কিছুই হতে পারে না।"[২১]

তথ্যসূত্র:

১। খাতুন, সন্‌জীদা। শান্তিনিকেতনের দিনগুলি। প্রথমা প্রকাশন, প্রথম সংস্করণ অক্টোবর ২০১৯, দ্বিতীয় সংস্করণ ফেব্রুয়ারি ২০২০, পৃ. ১৪।
২। খাতুন, সন্‌জীদা। সহজ কঠিন দ্বন্দ্বে ছন্দে। নবযুগ প্রকাশনী, ২০১৩, পৃ. ৪৭।
৩। তদেব।
৪। খাতুন, সন্‌জীদা। শান্তিনিকেতনের দিনগুলি। প্রথমা প্রকাশন, প্রথম সংস্করণ অক্টোবর ২০১৯, দ্বিতীয় সংস্করণ ফেব্রুয়ারি ২০২০, পৃ. ৫০।
৫। তদেব, পৃ. ১৮।
৬। তদেব, পৃ. ২৬।
৭। ৬. তদেব, পৃ ২২।
৮। খাতুন, সন্‌জীদা। সহজ কঠিন দ্বন্দ্বে ছন্দে। নবযুগ প্রকাশনী, ২০১৩, পৃ. ১০০।

৯। খাতুন, সন্‌জীদা। শান্তিনিকেতনের দিনগুলি। প্রথমা প্রকাশন, প্রথম সংস্করণ অক্টোবর ২০১৯, দ্বিতীয় সংস্করণ ফেব্রুয়ারি ২০২০, পৃ. ৪৬।

১০। তদেব, পৃ. ৪৭।

১১। তদেব, পৃ. ৪৮।

১২। তদেব, পৃ. ৯২।

১৩। তদেব, পৃ. ৯৩।

১৪। তদেব।

১৫। তদেব, পৃ. ৯৫।

১৬।খাতুন, সন্‌জীদা। সহজ কঠিন দ্বন্দ্বে ছন্দে। নবযুগ প্রকাশনী, ২০১৩, পৃ. ৯৫।

১৭। তদেব, পৃ. ১৩৫।

১৮। তদেব, পৃ. ১৪৯

১৯। তদেব, পৃ. ২০২।

২০। তদেব, পৃ. ১৬৭-১৬৮।

২১। তদেব, পৃ. ৩৬৭।

সহায়ক গ্রন্থ:

১। খাতুন, সন্‌জীদা। 'সহজ কঠিন দ্বন্দ্বে ছন্দে'। নবযুগ প্রকাশনী, ২০১৩।

২। খাতুন, সন্‌জীদা। 'শান্তিনিকেতনের দিনগুলি'। প্রথমা প্রকাশন, প্রথম সংস্করণ অক্টোবর ২০১৯, দ্বিতীয় সংস্করণ ফেব্রুয়ারি ২০২০।